কন্‌স্তান্‌তিন উশিন্‌স্কি

গল্প ও রূপকথা

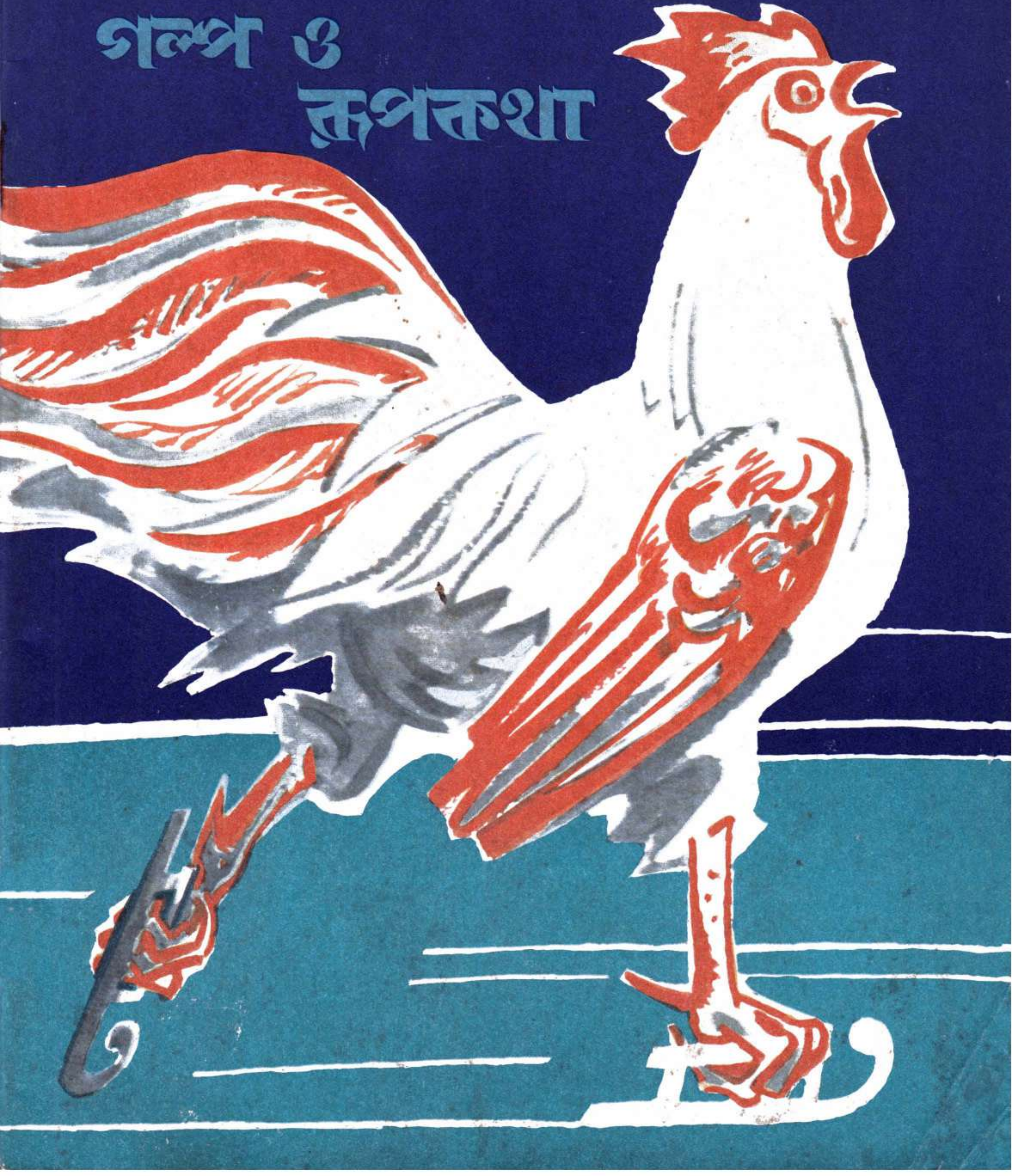

কন্‌স্তান্‌তিন দ্‌মিত্রিয়েভিচ্‌ উশিন্‌স্কি (১৮২৪-১৮৭০) একজন বিশিষ্ট রুশ শিক্ষাব্রতী এবং অসামান্য শিশুসাহিত্যিক। আজ এক শতাব্দীরও ওপর তাঁর রচনাবলী রুশ সাহিত্য সংকলনগুলিতে অপরিহার্যরূপে স্থান পেয়ে আসছে।
লেখকের সারগর্ভ ও বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনীগুলি থেকে শিশুরা তাদের পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, তারা তুলনা করতে, সাধারণ সিদ্ধান্ত টানতে এবং ভাবতে শেখে। গল্প ছেলেমেয়েদের খুবই ভালো লাগে, গল্পের বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল তাদের মনে গাঁথা হয়ে থাকে।
গল্প ও রূপকথার মাধ্যমে শিক্ষাব্রতী ও লেখক উশিন্‌স্কির প্রয়াস হল শিশুকে কর্মনিষ্ঠার শিক্ষা দেওয়া, তার অনুসন্ধিৎসার বিকাশ ঘটানো আর তার মনে প্রকৃতিপ্রেম সঞ্চার করা। উশিন্‌স্কি মনে করতেন, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানুষের সুখবিধান হয়, তাহলে সুখের জন্যই শিক্ষা না দিয়ে তার উচিত হবে মানুষ জীবনে যাতে পরিশ্রমী হতে পারে সেই জন্য প্রস্তুত করে তোলা।' যে মানুষ শিশুদের সত্যিকারের ভালোবাসেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করেন একমাত্র তাঁর পক্ষেই এই কথাগুলি লেখা সম্ভব।
উশিন্‌স্কির লেখা প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক কাহিনীগুলির নানা সংস্করণ সোভিয়েত ইউনিয়নে লক্ষ লক্ষ কপিতে মুদ্রিত হয়।

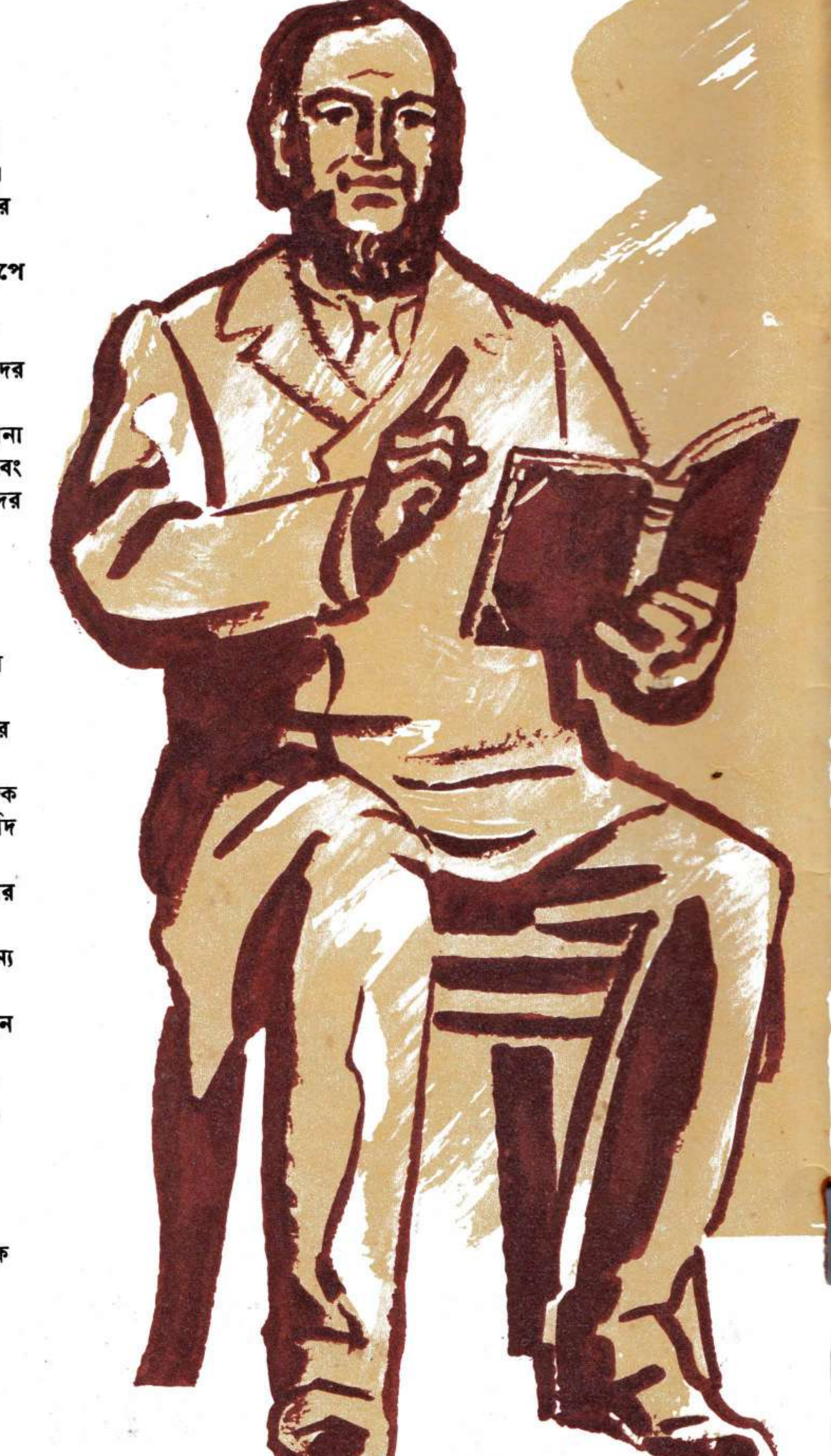

কন্‌স্তান্‌তিন উশিন্‌স্কি

গল্প ও রূপকথা

ছবি এঁকেছেন নিকোলাই গ্রিশিন

মূল রুশ থেকে অনুবাদ অরুণ সোম

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

К. Ушинский

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

На языке бенгали

K. Ushinsky

SHORT STORIES AND TALES

In Bengali

ছোট শিশুদের জন্য

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৬
সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000735-6

সূচী

দুই ছাগল ৫
সবুরে মেওয়া ফলে ৬
দাঁড়কাক ও ছাতারপাখি ৯
বদমেজাজী গোরু ১০
খরগোশ আর কাঁটাচুয়া ১৪
কাঠঠোকরা ১৭
কালসাপ ১৮
বন ও ছোট নদী ২২
মৌ খোঁজে মৌমাছি ২৪
একটি আপেল গাছের কাহিনী ২৬
চারটি সাধ ৩০

দুই ছাগল

একটা ছোট নদীর ওপরে সরু কাঠের গুঁড়ি দিয়ে একটা সাঁকো পাতা ছিল। একদিন সেই সাঁকোটার ওপরে দুই একগুঁয়ে ছাগলের মুখোমুখি দেখা। দুজনের পক্ষে একই সঙ্গে সাঁকোটা পেরোন অসম্ভব—এতই সরু ছিল সেটা। একমাত্র উপায় হল ওদের দুজনের একজনকে পিছু ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করা, যতক্ষণ না আরেকজন পার হচ্ছে।

ওদের একজন বলল, 'আমাকে পথ ছেড়ে দে।'

অন্যজন তার উত্তরে বলল, 'আহা, কী আমার লাটসাহেব এলেন রে! ফিরে যা বলছি! আমি প্রথম সাঁকোতে উঠেছি।'

'না ভাই, ওটি চলছে না। আমি তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তোর নাক টিপলে দুধ বেরোয়—আমি কিনা তোকে রাস্তা ছেড়ে দেব! কোন মতেই নয়!'

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে শক্ত মাথা দিয়ে দুজনার মাথায় ঢুঁ মারল, শিঙে শিঙ বাধিয়ে সরু সরু ঠ্যাঙে কুঁদোর ওপর ভর দিয়ে লড়াই শুরু করে দিল। কিন্তু সাঁকোর কুঁদোটা ছিল ভিজে, তাই মুহূর্তের মধ্যে দুই গোঁয়ারে পা পিছলে ঝপাত্ করে গিয়ে পড়ল নদীর জলে।

সবুরে মেওয়া ফলে

এক ছিল কুঁকড়ো আর কুঁকড়ী—দুই ভাই-বোন। একদিন কুঁকড়ো বাগানে ছুটে এলো, সবুজ রঙের কাঁচা-কাঁচা কিছু ফল দেখতে পেয়ে সেগুলো ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগল।

কুঁকড়ী-বোনটি তাকে বলল, 'খাস নে রে ভাইটি! সবুর কর, পাকলে খাস।'

কুঁকড়ো বোনের কথায় কান দিল না। ঠুকরে ঠুকরে খেতে খেতে এমন পেট বোঝাই করে খেল যে ঘরে গিয়ে পোঁছাতে তার রীতিমতো কষ্ট হল।

কুঁকড়ো কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'ওঃ! মাগো, পেটের ওপর সরষের পুলটিস লাগাল — তাতে ব্যথা করছে!'

কুঁকড়ী-বোন ওকে পেট ব্যথার ওষুধ খাওয়াল, পেটের ওপর সরষের পুলটিস লাগাল—তাতে ব্যথা গেল।

কুঁকড়ো সুস্থ হয়ে যেতে এবারে গেল মাঠে। সেখানে দৌড় ঝাঁপ দিতে দিতে সে তেতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল। তাই সে ঠাণ্ডা জল খাওয়ার জন্য ছুটল ছোট্ট নদীটার দিকে। বোন এবারেও তাকে নিষেধ করল, চেঁচিয়ে বলল:

'এখুনি খাস নে লক্ষ্মী ভাইটি। একটু সবুর কর, শরীরটা জুড়োক আগে।'

কুঁকড়ো তার কথায় কান দিল না, প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল খেল। শিগগিরই তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। বোনটি তাকে কষ্টেসৃষ্টে বাড়ি নিয়ে এলো।

কুঁকড়ী-বোন তাড়াতাড়ি করে বদ্যি ডেকে আনল। বদ্যি ওর জন্য কিছু বিচ্ছিরি তেতো ওষুধের বিধান দিল। বেশ কিছুকাল কুঁকড়োকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হল।

শীতকাল নাগাদ কুঁকড়ো সুস্থ হল। সে দেখতে পেল নদী বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার স্কেটিং করার সাধ হল। কুঁকড়ী-বোন তাকে নিষেধ করল:

'ওরে ভাইটি, সবুর কর। নদীটা পুরোপুরি জমাট বাঁধুক। বরফ এখনও বড় পাতলা, ভেঙে ডুবে যেতে পারিস।'

কুঁকড়ো বোনের কথায় কান দিল না। বরফের ওপর স্কেটিং করতে গেল। বরফ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়োও ঝপাৎ করে গিয়ে পড়ল জলে। এখানেই তার দফারফা হল।

দাঁড়কাক ও ছাতার পাখি

বাহারে ছাতারপাখি ডাল থেকে ডালে লাফাতে লাফাতে সমানে কিচিরমিচির করে কথা বলে চলেছে। কিন্তু দাঁড়কাক চুপচাপ বসে আছে ত আছেই।

'তুমি কোন কথা বলছ না কেন পড়শী? আমি তোমাকে যা যা বলছি তাতে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' ছাতারপাখি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল।

দাঁড়কাক তার উত্তরে বলল, 'তেমন একটা বিশ্বাস করতে পারছি না বন্ধু। তোমার মতো যে বিস্তর বকবক করে সে সম্ভবত বিস্তর মিছে বলে।'

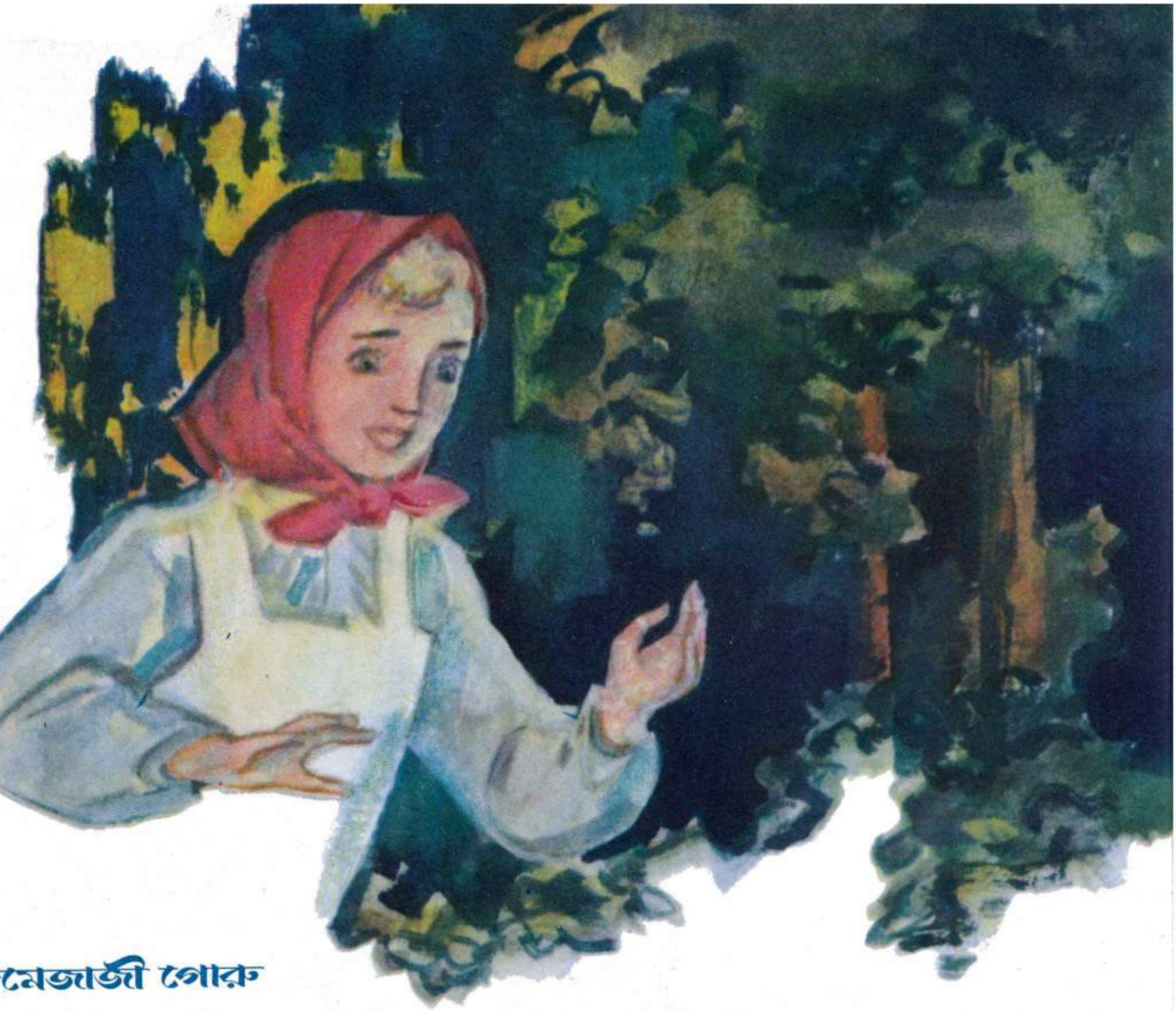

বদমেজাজী গোরু

আমাদের একটা গোরু ছিল। এমনই বদমেজাজী, আর যখন-তখন যাকে-তাকে ঢু মারত যে কী বলব! হয়ত সেই কারণে দুধও সে কম দিত।

মা আর বোন তাকে নিয়ে নাজেহাল। ওকে হয়ত বার করে গোরুর পালের মধ্যে চরতে দেওয়া হল, কিন্তু দেখা গেল দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরে এসেছে, নয়ত কোন খেতখামার বা গোলার ভেতরে ঢুকে পড়েছে — এবারে তাকে বার করে আন!

বিশেষ করে গোরুটা যখন বাছুর বিয়োত তখন তাকে ধরে রাখাই দায় হত। একবার ত পুরো গোয়ালঘরটাই শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে ভেঙে চুরে বাছুরের দিকে ছোটার চেষ্টা করল। আর শিঙজোড়াও ছিল তার তেমনি — লম্বা আর সিধে। বাবা ত কয়েক বার ঠিকই করে ফেলেছিলেন ওটার শিঙ করাত দিয়ে কেটে ছোট করে ফেলবেন, কিন্তু কেন জানি না কাটি-কাটি করেও আর কাটেন নি — আগে থেকে কিছু একটা বোধহয় টের পেয়েছিলেন তিনি। কী চটপটে আর ধড়িবাজই না ছিল গোরুটা! সে যখন লেজ উঁচিয়ে মাথা নীচু করে দৌড় শুরু করতে তখন ঘোড়ার পিঠে চেপেও তার নাগাল ধরা ভার। একবার গরমকালে সন্ধের অনেক আগেই সে রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে এলো। বাড়িতে ওর তখন বাছুর ছিল। মা গোরুটাকে দুইয়ে বাছুর ছেড়ে দিলেন। আমার বোন ফেনিয়ার তখন বছর বারো বয়স হবে। মা ওকে ডেকে বললেন: 'ফেনিয়া, গোরু আর বাছুরটাকে বার করে নদীর কাছাকাছি নিয়ে যা। ওখানে নদীর পাড়ে খানিকক্ষণ চরে বেড়াক। তবে হ্যাঁ, দেখবি,

খেতখামারে ঢুকে না পড়ে। রাত হতে এখনও ঢের দেরি। এতক্ষণ এখানে ওদের দাঁড় করিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।'

ফেনিয়া পাঁচনি হাতে গোরু-বাছুর তাড়িয়ে নিয়ে গেল নদীর ধারে। সেখানে ওদের চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিল। ফেনিয়া নিজে একটা উইলো ঝোপের নীচে বসে ঝুমকো ফুলের মালা গাঁথতে লাগল। পথে আসার সময় খেতের মধ্যে সে এই ফুলগুলো তুলেছিল। ফেনিয়া মালা গাঁথে আর গান গায়।

এমন সময় ফেনিয়া শুনতে পেল নদীর ধারের ঝোপের ভেতরে কিসের যেন একটা খসখস শব্দ। নদীর দু' পাড়েই কিন্তু ভরতি ঘন ঝোপঝাড়।

তাকিয়ে দেখল ঘন ঝোপের ফাঁক থেকে ছাই রঙের কী যেন একটা বেরিয়ে আসছে। বোকা মেয়েটা ভাবল ওটা আমাদের কুকুর ভুষো। তোমরা সকলেই জান যে নেকড়ে হুবহু কুকুরের মতন দেখতে, কেবল তফাত এই যে নেকড়ে ঘাড় ঘোরাতে পারে না, তার লেজটা লাঠির মতন সিধে, সে মুখ নীচু করে থাকে আর তার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে। কিন্তু ফেনিয়া কাছ থেকে কখনও কোন নেকড়ে দেখে নি।

ফেনিয়া তাই 'ভুষো, ভুষো' বলে আমাদের কুকুরের নাম ধরে কাছে ডাকতে লাগল। এমন সময় দেখতে পেল বাছুরটা, আর বাছুরের পেছন পেছন গোরুটাও পাগলের মতো সোজা ছুটে আসছে তার দিকে। ফেনিয়া এক লাফে উঠে একটা বড় উইলো ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল — কী যে করবে বুঝে উঠতে পারল না। বাছুর ধেয়ে আসছে তার দিকে, এদিকে গোরুটা ওদের দুজনের দিকে পেছন ফিরে পাছা দিয়ে দুজনকেই গাছের গায়ে চেপে ধরল। মাথা হেঁট করে সে গর্জন করতে লাগল, সামনের পায়ের

খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল, আর শিঙজোড়া বাগিয়ে ধরল সোজা নেকড়েটার দিকে।

ফেনিয়া দারুণ ভয় পেয়ে গেল। দুহাতে গাছ জড়িয়ে ধরে চেঁচাতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। এদিকে নেকড়ে সোজা গোরুটার দিকে ধেয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে এক লাফে পিছিয়ে যেতে হল। বুঝতে বাকি রইল না যে প্রথম ধাক্কায় সে শিঙের গুঁতো খেয়েছে। নেকড়ে দেখল সরাসরি কিছু হবার নয়। তাই সে একবার এপাশ থেকে আরেকবার ওদিক থেকে লাফিয়ে পড়ে কোনরকমে গোরুটাকে এক ধার থেকে ধরে কাবু করে ফেলার কিংবা বাছুরটাকে বাগানোর মতলব করতে লাগল। কিন্তু যেদিকেই ধেয়ে যায় তার মুখোমুখি শিঙজোড়া ঠিক আছে।

ফেনিয়া তখনও আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। ওর ইচ্ছে ছিল ওখান থেকে পালায়, কিন্তু গোরু ওকে ছাড়ে না, সমানে গাছের গায়ে চেপে ধরে।

ফেনিয়া তখন সাহায্যের জন্য চেঁচিয়ে লোকজন ডাকতে লাগল। আমাদের একজন কসাক খেতচাষী টিলার ওপর একখণ্ড জমিতে হাল দিচ্ছিল। গোরুর হাম্বা ডাক আর সেই সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ের চিৎকারও তার কানে গেল। তড়িঘড়ি লাঙল ফেলে দিয়ে যেদিক থেকে চিৎকার আসছিল সে দিকে ছুটল।

কসাক দেখতে পেল কী কাণ্ড হচ্ছে। কিন্তু খালি হাতে নেকড়েটার সঙ্গে লাগতে যাবার সাহস তার হল না — ওটা ছিল এতই বিরাট আর বিকট চেহারার। কসাকের ছেলেও ঐ একই খেতে লাঙল চষছিল। কসাক তার ছেলের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল।

নেকড়ে যখন দেখতে পেল লোকজন ছুটে আসছে তখন সে ঘাবড়ে গেল, আরও দু' একবার খ্যাঁক খ্যাঁক করল, গর্জনও করল, কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে শেষকালে ঝোপের ভেতরে চম্পট দিল।

ফেনিয়া এমন ভড়কে গিয়েছিল যে কসাক-চাষীরা কোনরকমে ওকে বাড়ি পেঁাছে দিল।

বাবা তখন গোরুটার শিঙজোড়া করাত দিয়ে কাটা হয় নি বলে খুশি হলেন।

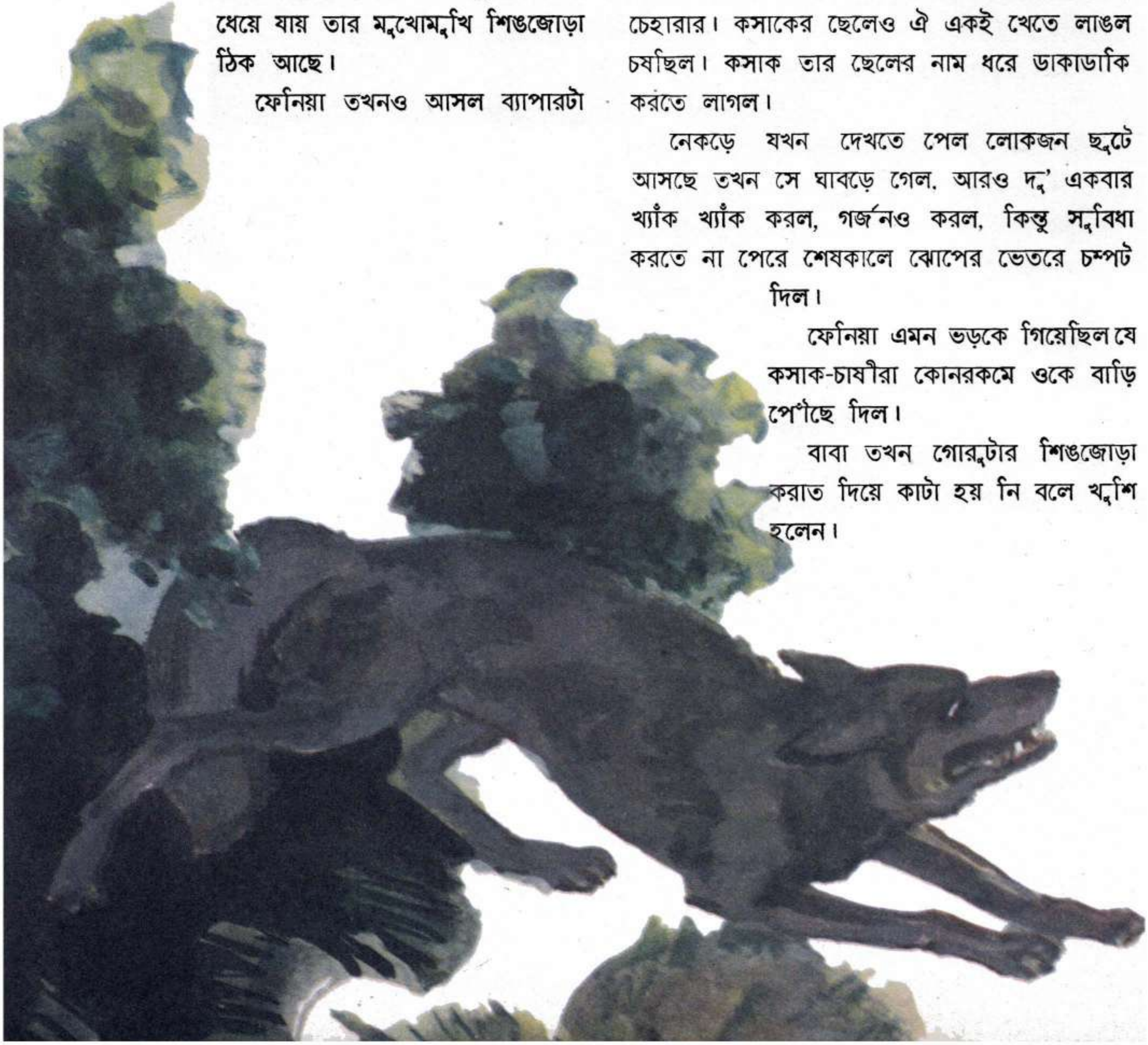

খরগোশ আর কাঁটাচুয়া

মোলায়েম সাদা ধবধবে খরগোশ কাঁটাচুয়াকে বলল, 'কী বদখত কাঁটাওয়ালা একটা ধোকড়া গায়ে চড়িয়ে আছ ভাই!'

উত্তরে কাঁটাচুয়া বলল, 'তা ঠিকই। তবে কিনা, জান, আমার খোঁচা খোঁচা পোশাকটা কুকুর আর নেকড়ের হাত থেকে আমাকে বাঁচায়। তোমার গায়ের ঐ চমৎকার চামড়া অমনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে কি?'

খরগোশ কোন জবাব না দিয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

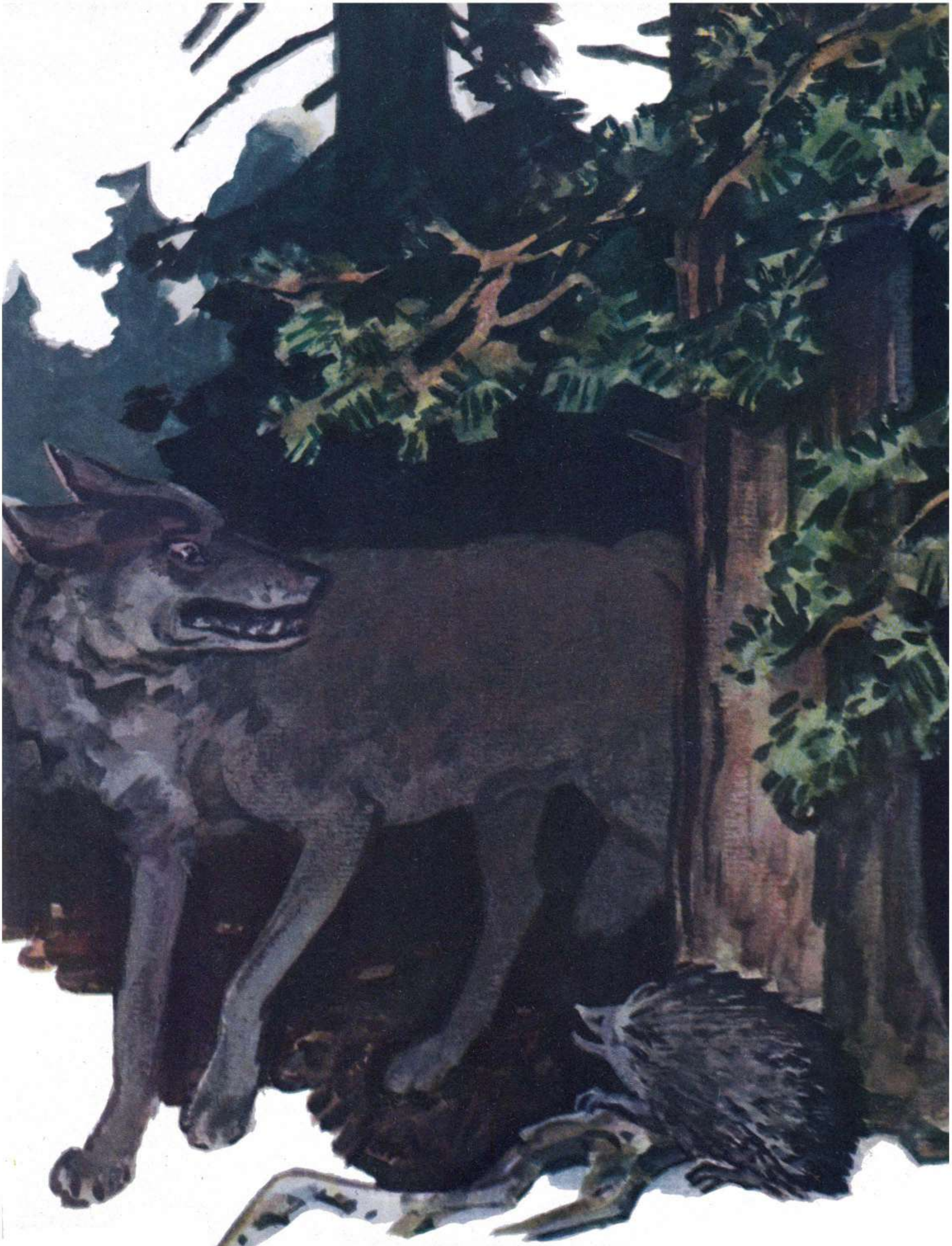

কাঠঠোকরা

'ঠক্-ঠক্-ঠক!' নির্জন বনের ভেতরে একটা পাইন গাছের ওপরে কালো রঙের এক কাঠঠোকরা ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পায়ের নখ দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরে, লেজে ভর দিয়ে, ঠোঁট ঠুকে আওয়াজ করে চলেছে—গাছের ছাল বাকলের ভেতর থেকে পিঁপড়ে আর অন্যান্য পোকামাকড়দের তাড়া দিয়ে বার করার চেষ্টা করছে। গাছের গুঁড়ির চারধারে কয়েক পাক ছুটল—পোকামাকড়ের নামগন্ধ নেই। 'গতিক সুবিধের নয় দেখা যাচ্ছে!' ভয়ে সবাই জড়সড় হয়ে আছে, গাছের বাকলের ভেতরে লুকিয়ে আছে—চট করে বেরিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 'ঠক্-ঠক্-ঠক্!' কালো কাঠঠোকরা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়ে গাছের ছাল ছেঁদা করে ফেলল, তারপর ফুটোর ভেতরে লম্বা জিভটা ঢুকিয়ে দিয়ে বঁড়শীতে মাছ গেঁথে তোলার মতো টেনে বার করে আনল একটা ছোট্ট পিঁপড়ে।

আমাদের গাঁয়ের আশেপাশে, খাত আর ভিজে সেঁতসেঁতে জায়গাগুলো অসংখ্য সাপে ছেয়ে থাকত।

ঢোঁড়াসাপের কথা বাদই দিলাম। নির্বিষ ঢোঁড়াসাপ আমাদের এখানকার লোকজনের এমনই গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে তারা সাপই বলত না। ঢোঁড়াসাপের মুখের ভেতরে খুদে খুদে ধারাল দাঁত আছে। তারা ইদুঁর, এমনকি ছোট ছোট পাখিও ধরে, সম্ভবত চামড়ায় দাঁতও বসাতে পারে, কিন্তু ওদের দাঁতে বিষ নেই, তাই কামড়ে ক্ষতি হওয়ায় বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই।

ঢোঁড়াসাপের কোন সীমাসংখ্যা নেই আমাদের এখানে, বিশেষত মাড়াইয়ের জায়গার পাশে পড়ে-থাকা খড়ের গাদার ভেতরে। সূর্য একটু তেতে উঠলে ওগুলোও ওখান থেকে সরসর করে বেরিয়ে আসে। কেউ সামনে এলে হিসহিস করে, জিভ কিংবা হুল বার করে দেখায়। কিন্তু সাপেরা ত আর হুল দিয়ে কামড়ায় না! এমনকি রান্নাঘরে মেঝের নীচেও ঢোঁড়াসাপ বাসা বেঁধে থাকত। কখন

কখন এমন হত যে বাচ্চারা মেঝেতে বসে দুধ খাওয়া শুরু করলে ঢোঁড়াসাপ সুরসুর করে বেরিয়ে এসে বাটির দিকে মাথা বাড়িয়ে দিত, বাচ্চারাও সঙ্গে সঙ্গে চামচ দিয়ে তার মাথায় ঘা বসিয়ে দিত।

কিন্তু নির্বিষ ঢোঁড়াসাপই একমাত্র সাপ ছিল না, এছাড়াও ছিল কালো রঙের বিশাল বিষাক্ত সাপ। ঢোঁড়াসাপের মাথার কাছে যে হলুদ রঙের ডোরা দেখা যেত, এদের তেমন থাকত না। আমাদের এখানে এ ধরনের সাপকে বলা হয় কালসাপ। কালসাপ অনেক সময়ই গোরু ভেড়ার পালকে কামড়াত। গাঁয়ের বুড়ো কর্তা ওথ্‌রিম বিষধর সাপের কামড়ের ওষুধ জানতেন। গ্রামবাসীরা যদি সময়মতো তাঁকে ডেকে আনতে না পারত, তাহলে অবোলা প্রাণীটি দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যেত।

আমাদের গাঁয়ের একটা বাচ্চা ছেলে কালসাপের কামড়ে মারা যায়। সাপটা ঠিক ওর কাঁধের কাছটায় কামড়ায়। ওথ্‌রিম এসে পড়ার আগেই ফোলাটা কাঁধ থেকে ঘাড়ে, তারপর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। বাচ্চাটা প্রলাপ বকতে শুরু করল, ছটফট করতে লাগল, দুদিন পরে মারা গেল। ছোটবেলায় আমি কালসাপ সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, এই সাপকে আমি দারুণ ভয় করতাম। আমার মনে হত একদিন বুঝিবা আমাকে তার মুখোমুখি হতে হবে।

আমাদের বাগানের পেছনের পাহাড়ী খাতটায় প্রতি বছর বসন্তকালে একটা ছোট নদীর ধারা ছুটে চলে, কিন্তু গরমকালে সেটা সামান্য সেঁতসেঁতে থাকে, লম্বা লম্বা ঘন ঘাস গজায় সেখানে। একবার লোকজন শুকনো পাহাড়ী খাতটার মধ্যে ঘাস কাটছিল। ঘাস-কাটা মানেই আমার কাছে ছিল একটা উৎসবের মতন, বিশেষত যখন বিচালি গাদা করে রাখা হত। এই সময় আমি ঘাস কাটার মাঠের ওপর ছোটাছুটি শুরু করে দিতাম, তারপর ঝাট করে বিচালির গাদায় আছড়ে পড়ে সুগন্ধী বিচালির ভেতরে হুটোপাটি খেতাম। শেষকালে কিষানীরা এসে আমাকে তাড়িয়ে দিত, পাছে বিচালির গাদা নষ্ট করে দিই।

এবারেও আমি ছুটোছুটি করতে লাগলাম, ডিগবাজী খেতে শুরু করে দিলাম। কিষানীরা ছিল না, ঘাসুড়েরাও অনেক দূরে চলে গেছে। কেবল আমাদের বিরাট কালো কুকুর ব্রোভ্‌কো গাদার ওপর শুয়ে শুয়ে হাড় চিবোচ্ছিল।

একটা বিচালির গাদার ওপর ডিগবাজী খেলাম, বার দুয়েক গড়ালাম। এমন সময় ভয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। ঠান্ডা পিছলে মতন কী যেন একটা আমার হাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে গেল। প্রথম যে চিন্তাটা আমার মাথার ভেতরে ঝলক দিল তা হল: কালসাপ! তা-ই বটে। একটা বিরাট কালসাপ আমার হুটোপাটিতে উত্ত্যক্ত হয়ে বিচালির গাদা থেকে বেরিয়ে এসে লেজের ওপর খাড়া হয়ে ফণা তুলে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে।

আমি ছুটে পালিয়ে না গিয়ে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন সাপটা তার পলকহীন চোখের স্থির দৃষ্টি দিয়ে আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। আর এক মিনিট—তারপরই সব শেষ। এমন সময় ব্রোভ্‌কো তীরবেগে বিচালির গাদা থেকে লাফিয়ে পড়ল সাপটার ওপরে। ওদের দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল জীবন-মরণ যুদ্ধ।

কুকুরটা দাঁত দিয়ে সাপটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পায়ের তলায় মাড়াতে লাগল। সাপ ওর মুখে, বুকে, পেটে ছোবল মারল। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল মাটিতে পড়ে আছে কেবল সাপের শরীরের কয়েকটা ছিন্নভিন্ন টুকরো। এদিকে ব্রোভ্‌কো ছুটে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

একমাত্র এর পরই আমি আমার গলার স্বর ফিরে পেলাম, আমি চিৎকার ও কান্না শুরু করে দিলাম। ঘাসুড়েরা ছুটে এলো। সাপটার শরীরের ছেঁড়া টুকরোগুলো তখনও একটু একটু নড়ছিল। ওরা কাস্তে দিয়ে পিটিয়ে সেটুকুও শেষ করে দিল।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে ঐদিন থেকে ব্লোভকোর আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ও যে কোথায় গেল কে জানে।

কেবল দু' সপ্তাহ বাদে ও বাড়ি ফিরে এলো। ও তখন রোগা, হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে, তবে শরীর ওর সুস্থ। বাবা বললেন যে কুকুরেরা এক বিশেষ ধরনের ঘাসপাতার সন্ধান জানে যা বিষধর সাপে কামড়ালে তাদের সারিয়ে তোলে।

বন ও ছোট নদী

অন্ধকার সেঁতসেঁতে বনের ভেতর দিয়ে, জলাভূমি আর শেওলার মাঝখান দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা ছোট নদী কলকল শব্দে নালিশ জানায় যে বন পরিষ্কার আকাশ আর দূরের এলাকা তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখছে, ঝলমলে সূর্যকিরণ আর চঞ্চল বাতাস কাউকেই তার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। নদী বিড়বিড় করে বলে, 'লোকে এই হতচ্ছাড়া বনটাকে কেটেও ফেলে না!'

বন মৃদুস্বরে বলল, 'বাছা আমার! তুমি এখনও বেশ ছোট। আমার ছায়া না থাকলে সূর্য আর হাওয়া যে তোমাকে শুকিয়ে খটখটে করে ফেলত, এটা বোঝার মতো বয়স তোমার হয় নি। তোমার স্রোত এখনও দুর্বল, আমি যদি তোমাকে না আগলাতাম তাহলে তোমার এই স্রোত শিগগিরই শুকিয়ে যেত। সবুর কর, আমার ছায়ায় থেকে আগে তোমার বল হোক, তাহলে খোলা জায়গায় বেরোবার ক্ষমতা তোমার হবে। তখন আর তুমি একটা দুর্বল ছোট নদী হয়ে থাকবে না, তুমি হবে এক দুর্বার নদী। তখন তোমার জলধারার ওপর ঝলমলে সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়লেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না, তুমি নির্ভয়ে প্রবল হাওয়ার সঙ্গে খেলা করতে পারবে।'

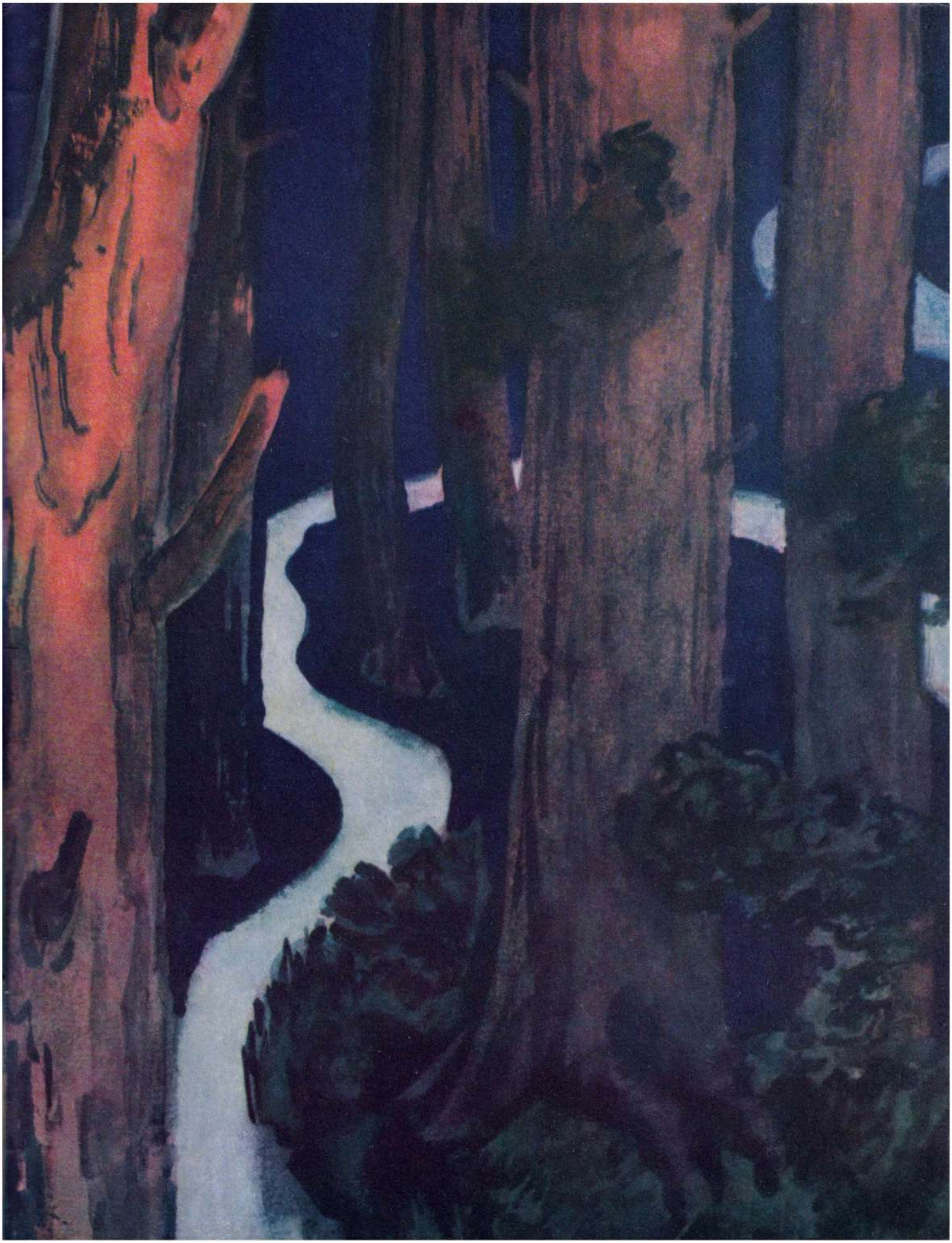

মৌ খোঁজে মৌমাছি

বসন্তকাল এসে গেল। মাঠঘাট থেকে সূর্য তুষাররাশি তাড়িয়ে দিয়েছে। গত বছরের পুরনো হলদেটে ঘাসের মধ্য থেকে উঁকি মারছে ঘন সবুজ ডাঁটা, গাছে গাছে কুঁড়ি ফুটছে, কচি পাতা গজাচ্ছে।

এক মৌমাছি জেগে উঠল শীতকালের ঘুম থেকে। সে তার লোমশ পায়ের থাবা দিয়ে চোখ রগড়াল, বন্ধুদের ডেকে তুলল। ওরা সবাই জানলা দিয়ে উঁকি মারল কী ঘটছে দেখার জন্য — তুষার আর জমাট বরফ, কনকনে উত্তুরে হাওয়া চলে গেছে কি?

মৌমাছিরা দেখতে পেল সূর্য ঝলমল করছে, সর্বত্র আলো আর আলো, গরম-গরম লাগছে। ওরা তাই মৌচাক থেকে বেরিয়ে এসে উড়ে গেল আপেল গাছের কাছে।

আপেল গাছকে জিজ্ঞেস করল, 'আপেল গাছ, আপেল গাছ, বেচারি মৌমাছিদের জন্যে তোমার কাছ থেকে কিছু হবে কি? সারাটা শীতকাল আমরা খিদেয় মরেছি।'

আপেল গাছ বলল, 'না, নেই। তোমরা বড্ড তাড়াতাড়ি চলে এসেছ। আমার ফুল এখনও কুঁড়ির ভেতরে লুকানো। চেরি গাছের কাছে গিয়ে দেখ একবার।'

মৌমাছিরা চেরি গাছের কাছে গিয়ে বলল, 'চেরি গো চেরি, আমরা মৌমাছিরা খিদেয় মরে যাচ্ছি। আমাদের জন্যে এক-আধটা ফুল হবে কি?'

চেরি গাছ উত্তরে বলল, 'কাল এসো গো বাছারা। আজ এখন পর্যন্ত আমার একটাও ফুল ফোটে নি। খুললেই আমি তোমাদের খুশিমনে ডাকব।'

মৌমাছিরা উড়ে গেল টিউলিপের কাছে। টিউলিপের বিচিত্রবর্ণের পেয়ালাটার ভেতরে উঁকি মেরে দেখল। কিন্তু তাতে না আছে গন্ধ, না মধু।

মৌমাছিরা মন খারাপ করে বাড়ি ফিরতে যাবে এমন সময় একটা ঝোপের ভেতরে ওরা দেখতে পেল গাঢ় নীল রঙের ছোট্ট একটা ফুল। ফুলটার কোন বাহারই নেই। নীল ফুলটা মৌমাছিদের সামনে সুগন্ধ আর মিষ্টি রসে ভরা তার পেয়ালা তুলে ধরল। মৌমাছিরা প্রাণভরে ভোজ খেয়ে আকণ্ঠ রস পান করে ফুর্তিতে বাড়ি ফিরে গেল।

একটি আপেল গাছের কাহিনী

এক

বনের ভেতরে একটা বুনো আপেল গাছ জন্মেছে। শরৎকালে সেই গাছ থেকে একটা টক আপেল মাটিতে খসে পড়ল। পাখিরা আপেলটাকে ঠুকরে ঠুকরে খেল, আপেলের বিচিও ঠোকরাল। কেবল একটা বিচি মাটির ভেতরে গিয়ে লুকালো, সেখানেই রয়ে গেল।

বিচিটা বরফের তলায় শীতকাল কাটিয়ে দিল। বসন্তকালে সূর্য ভিজে মাটিতে সামান্য তাপ দিতে বিচি থেকে অঙ্কুর বেরোতে লাগল। বিচিটা তার শেকড় নীচে চালিয়ে দিল, ওপরের দিকে বেরোল প্রথম একজোড়া কচি পাতা। কচি পাতা দুটোর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো ডাঁটা, সেই সঙ্গে কুঁড়ি, আর কুঁড়ি ফুটে দেখা দিল সত্যিকারের সবুজ পাতা। কুঁড়ির পর কুঁড়ি, পাতার পর পাতা, শাখার পর শাখা—এই ভাবে বছর পাঁচেক যেতে দেখা গেল যেখানে আপেলের বিচিটা পড়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিব্যি একটা আপেল গাছ।

এক মালি বনে এলো কোদাল নিয়ে। আপেল গাছটা দেখে সে বলল, 'বাঃ, চমৎকার গাছটা ত! আমার কাজে লাগবে।'

মালি যখন আপেল গাছটা খুঁড়ে তুলতে শুরু করল তখন ভয়ে আপেল গাছের থরহরি কম্প, সে মনে মনে ভাবল, 'এবারে আমি গেলাম!'

কিন্তু মালি আপেল গাছটাকে শেকড় বাঁচিয়ে সাবধানে খুঁড়ে তুলল। ওটাকে তার বাগানে নিয়ে গিয়ে ভালো জমিতে লাগিয়ে দিল।

দুই

বাগানে ঠাঁই পাওয়ার পর ত চারাগাছটার গর্ব আর ধরে না। সে মনে মনে ভাবল, 'আমাকে যখন বন থেকে বাগানে এনে বসানো হয়েছে তখন আমি নির্ঘাত খুব দামী কোন গাছ হব।' বেশ গুমর করে চারদিকে তাকিয়ে দেখে—কদাকার কতকগুলো গাছের গুঁড়ি, সবগুলোই নেকড়া দিয়ে জড়ানো। সে জানত না যে এসে পড়েছে স্কুলে।

পরের বছর মালি একটা বাঁকা ছুরি নিয়ে এসে চারাগাছটা কাটতে শুরু করল। চারাগাছ কাঁপতে কাঁপতে ভাবল, 'এবারে আমি গেলাম আর কি!'

মালি গাছটার মাথা মুড়িয়ে সমস্ত সবুজ পাতা ছেঁটে ফেলল। রেখে দিল কেবল তার কান্ডটা। সেটাও আবার ওপর থেকে চিরে ফেলল। চেরা জায়গাটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ভালো জাতের আপেল গাছের একটা কচি চারা। জখমের জায়গাটা লেপে ঢেকে দিল, একটা নেকড়া দিয়ে জড়িয়ে দিল। নতুন কলমের চারপাশে কতকগুলো খুঁটি পুঁতে দিয়ে চলে গেল।

তিন

আপেল গাছটা বেশ অসুখে পড়ল। কিন্তু বয়স তার কম আর বলও তার আছে, তাই শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠল, বেড়ে উঠল অন্যের ডাল নিয়ে। ডালটা শক্তিমান বুনো আপেলের রস খেয়ে ধাঁকধাঁক করে বাড়তে থাকে, কুঁড়ির পর কুঁড়ি, পাতার পর পাতা ছাড়ে। অঙ্কুরের পর অঙ্কুর,

ডালের পর ডাল গজাতে থাকে। এমনি করে বছর তিনেক যেতে ছোট গাছটা সাদা-গোলাপী রঙের সুগন্ধী ফুলে ছেয়ে গেল। তারপর ফুলের পাপড়ি খসে পড়ল, তাদের জায়গায় দেখা দিল সবুজ রঙের কুঁশি। শরৎকালের দিকে কুঁশি থেকে হল আপেল — আর সে আপেল বুনো টক আপেল নয় — বড় বড়, গোলাপী আভার, মিষ্টি, রসাল! চারাগাছটা থেকে এত সুন্দর আপেল গাছ হল যে অন্যান্য বাগান থেকে লোকে কলমের গাছ করার জন্য তার চারা নিতে আসত।

চারটি সাধ

মনের সাধ মিটিয়ে বরফের ঢাল গড়িয়ে স্লেজে চড়ে নামা এবং জমাট নদীর ওপর স্কেটিং করার পর মিতিয়া যখন ঘরে ফিরে এলো তখন তার দু' গালে গোলাপী ছোপ ধরেছে, তাকে দেখাচ্ছিলও বেশ খোশমেজাজী।

সে তার বাবাকে বলল, 'ওঃ, শীতের দিনে

কী মজাই না লাগে! আহা, সব সময়ই যদি শীতকাল হত!'

'আমার নোটবইয়ে তোর মনের সাধ লেখ্,' বাবা বললেন।

মিতিয়া লিখল।

বসন্ত এলো।

মিতিয়া সবুজ মাঠে ইচ্ছেমতো রঙবেরঙের প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটোছুটি করল, যত রকমের পারে ফুল ছিঁড়ল, তারপর বাবার কাছে ছুটে এসে বলল:

'কী সুন্দর এই বসন্ত! বছরের সমস্ত সময় যদি বসন্তকাল হত!'

বাবা আবার নোটবই বার করলেন, মিতিয়াকে ওর মনের সাধ লিখতে বললেন।

গরমকাল এলো। মিতিয়া ওর বাবার সঙ্গে মাঠে গেল ঘাস কাটতে। গরমের দিন অমনিতেই লম্বা। সারাটা দিন ধরে মিতিয়া আমোদে মেতে রইল — মাছ ধরল, অনেক ফলপাকড় তুলল, সুগন্ধী বিচালির মধ্যে ডিগবাজী খেল। সন্ধ্যাবেলায় বাবাকে বলল:

'আজকে কিন্তু আমার দারুণ মজা হল! আহা, গরমকালের যদি কোন শেষ না থাকত!'

মিতিয়ার এই সাধটাও ঐ নোটবইতে লেখা হল।

শরৎকাল এলো। বাগানে টসটসে লাল-লাল আপেল, পাকা হলুদ নাশপাতি এই সব ফলমূল পাড়ার পালা। মিতিয়ার আনন্দ আর ধরে না। বাবাকে সে বলল:

'শরৎকালই হল বছরের সবচেয়ে ভালো সময়!'

বাবা তখন নোটবই বার করে ছেলেকে দেখিয়ে বললেন যে বসন্তকাল শীতকাল গরমকাল সম্পর্কেও এই একই কথা ও বলেছিল।

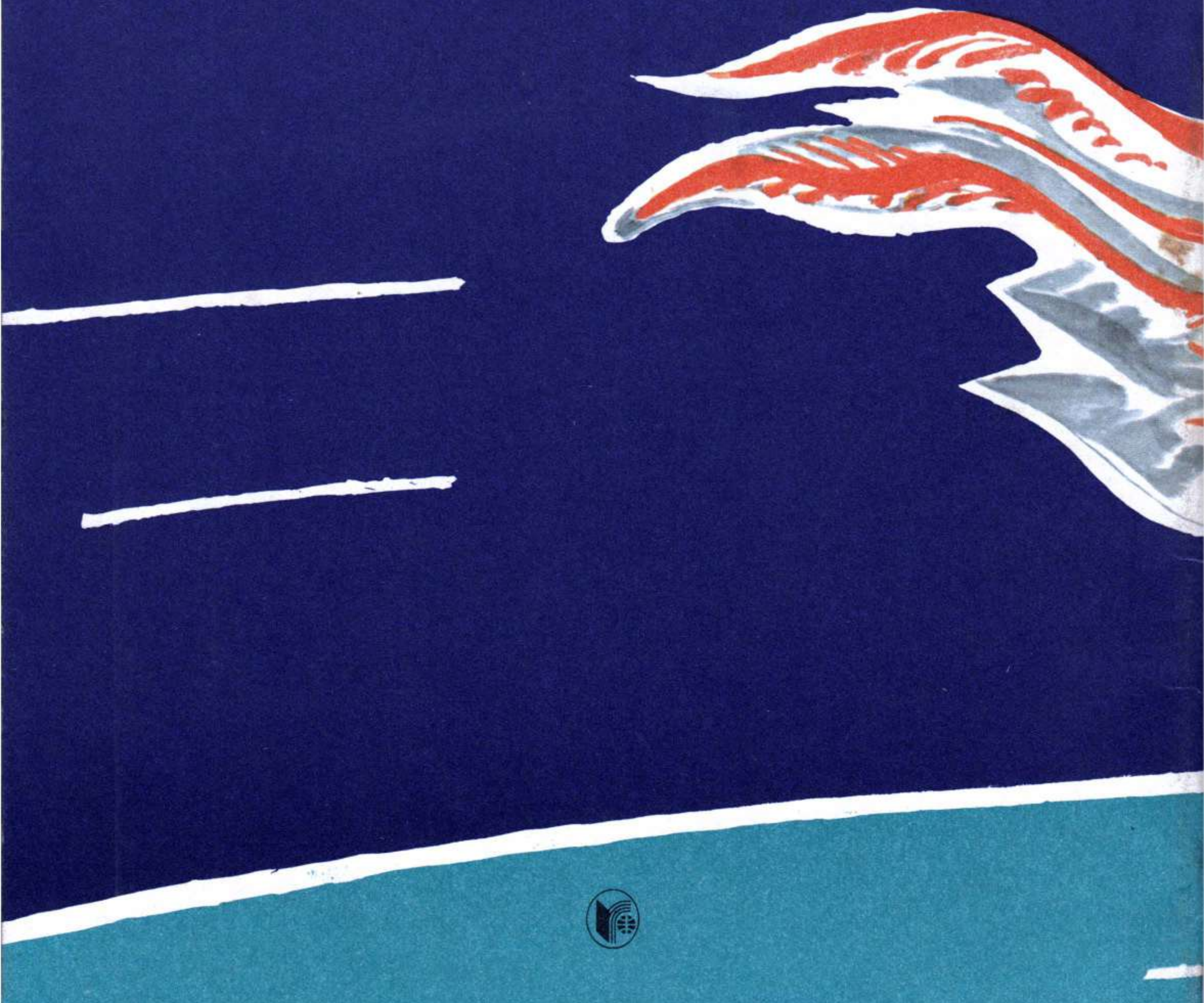

ISBN 5-05-000735-6